

সিয়াম ও রমাদান

তাকওয়া অর্জনের পাথেয়

রচনা ও সংকলন

মোঃ শারফুদ্দীন শরীফ

কামিল (হাদীস), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ (অনার্স), এমএ, এমফিল
আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কামরুল ইসলাম

বিএ (অনার্স), এমএ (ALT)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Tanzeel Publications

ভূমিকা

রমাদান নিঃসন্দেহে পুরো মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত প্রত্যাশিত এবং কাঙ্ক্ষিত সময়। মুমিন হৃদয় পুরোটি বছর জুড়ে এই মাসটির জন্য অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এই প্রত্যাশায় যে, নিজেকে পুরোটাই শুধরিয়ে নিবে ইন-শা-আল্লাহ। নিজের গুনাহগুলো গাছের ঝরে পড়া পাতার মতো ঝরিয়ে নিজেকে নিষ্পাপ করে তুলবে। মুসলিম মিল্লাতের আমলের বসন্তকাল এই রমাদানে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের প্রকাশ্য ও চির শত্রু শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, জাহান্নামের সকল দরজাগুলো যেমন বন্ধ করে দেন ঠিক একইভাবে জান্নাতের সকল দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের জন্য এর চেয়ে আনন্দের, ভালো লাগা আর ভালোবাসার কি হতে পারে যে আমরা শত্রুমুক্ত অবস্থায় মহান রবের সান্নিধ্যে যাওয়ার সবচেয়ে উত্তম পরিবেশ পেতে বসেছি। এটি নিঃসন্দেহে এমন এক মাস যেখানে আমলের প্রতিদানগুলো বেড়ে যায় গাণিতিক হারে; কখনো কখনো তা সাতশ গুণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সুবহানআল্লাহ।

অফুরন্ত রহমত এবং নিয়ামতের এই মাসটি আরবি বর্ষের নবম মাস। এ মাসের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সাওম, আর এই মাসের মর্যাদার অন্যতম কারণ হলো মহান আল্লাহ ﷻ এ মাসেই মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমকে নাযিল করেছেন। রমাদানের আগমনে আমাদের প্রিয় নবী ﷺ অনেক বেশি আনন্দিত হতেন। সাহাবীদের কাছে এ মাসের আগমনবার্তা পৌঁছে দিতেন। বর্ণনা করতেন এ মাসের অসংখ্য ফজিলতের কথা, আলহামদুলিল্লাহ।



সূচিপত্র

সাওমের পরিচয়	১১
সাওমের ইতিহাস ও রমাদান মাসের সাওম	১৪
কোরআনের আয়নায় সাওম	২০
হাদীসের আয়নায় সাওম	২৩
সাওমের উপকারিতা	৩২
সাওমের আদব	৩৪
সাওম অবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় আমলসমূহ	৩৮
সাওম ফরজ হওয়ার শর্ত	৪১
যাদের উপর সাওম ফরয নয়	৪২
সাওম ভঙ্গের কারণ	৪৩
রমাদানের প্রস্তুতি	৫২
রুটিন: রমাদান কার্যকর করার পাথেয়	৬১
রমাদান সফল করার মূলমন্ত্র	৬৫
ইতিকাফের পরিচয়	৮৫
মহিমান্বিত রাত : লাইলাতুল কদর	৯৩
মুসলিমদের সর্ববৃহৎ উৎসব: ঈদ	১০৬
মুমিনের রমাদান পরবর্তী জীবন	১১৭
সারকথা	১২৬



সাওমের পরিচয়

সাওমের অভিধানিক অর্থ

সাওম (الصَّوْمُ) শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহুবচন হলো (الصِّيَام) সিয়াম। সাওম পালনকারীকে 'সায়েম' বলা হয়। সাওমকে ফার্সিতে বলা হয় রোজা এবং সাওম পালনকারীকে বলা হয় রোজাদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো পরিহার করা বা স্তব্ধ হওয়া।

সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞা

আল-কামুসুল ফিকহি গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> সাওম হলো, নির্দিষ্ট সময় নিয়তসহ সাওম ভঙ্গকারী সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি (হাকিকী ও হুকমী: খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্ভোগ) থেকে বিরত থাকা।

আল্লামা যুরযানী ﵀ বলেন,

> সুবহে সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ এবং যৌনাচার থেকে নিয়তের সাথে বিরত থাকার নাম হলো সাওম।

বদরুদ্দীন 'আইনী ﵀ বলেন,

> খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্ভোগ; এ তিনটি কাজ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকার নাম হলো সাওম।

সাওমের ইতিহাস ও রমাদান মাসের সাওম

সাওম বা রোজা নাম ও ধরনভেদে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহুল প্রচলিত একটি ধর্মীয় বিধান, যা মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয় (ফরজ) একটি ইবাদত। শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর শরীয়তে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওমের বিধান দেওয়া হয়েছে, তেমনি সাওমের বিধান দেওয়া হয়েছিল পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আতেও; পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধর্ম-কর্মেও রয়েছে সাওমের বিধান। আসমানী ধর্ম ছাড়াও মানব রচিত বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ে সাওমের বিধান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরজ করা হয়েছে। যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। *(সূরা আল-বাকারা, ১৮৩)*

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যেও প্রচলিত ছিল সাওম বা রোজা নামের এই ধর্মীয় বিধান।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ-এর মতে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক মাসে তিন দিন ও আশুরার দিনে সাওম ফরজ ছিল, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ওপর মাসে তিন দিন ও 'আশুরার দিনে সাওম ফরজ ছিল। পরবর্তীতে রমাদান মাসের দ্বারা এ সাওম রহিত হয়।

মু'আয ইবন জাবাল ﷺ বলেন, উক্ত তিন দিনের সাওম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের সাওমের দ্বারা রহিত হয়। অতঃপর উক্ত কয়েক দিনের সাওম আবার রমাদানের সাওম দ্বারা রহিত হয়। *(তাফসীরে কুরতবী: ২/২৭৫)*

কোরআনের আয়নায় সাওম

যে আয়াতের মাধ্যমে সাওম ফরজ হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারিতা অর্জন করতে পার। *(সূরা বাকারা, ১৮৩)*

সিয়াম পালনে উৎসাহ ও গুরুত্ব প্রদান

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

অনুবাদঃ নির্ধারিত কিছু দিনের জন্য অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে, অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণ কর হয়। তবে সাওম পালন করাই তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। *(সূরা বাকারা, ১৮৪)*

হাদীসের আয়নায় সাওম

সাওম শুধু আল্লাহর জন্য

قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

অনুবাদঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তান তার প্রতিটি কাজ নিজের জন্য করে। কিন্তু সাওম কেবল আমার সন্তুষ্টির জন্য পালন করে। তাই সাওমের প্রতিদান আমি নিজে দিব। আর সাওম হলো ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেদিন সাওম পালন করবে সে যেন অসংলগ্ন কথাবার্তা না বলে এবং শোরগোল না করে। অতঃপর কেউ যদি তাকে কটু কথা বলে অথবা তার সাথে ঝগড়া করে তবে সে যেন বলে আমি একজন সাওম পালনকারী। মুহাম্মদের আত্মা যে রবের হাতে তার কসম নিশ্চয় সাওম পালনকারীর মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশকের ঘ্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। সাওম পালনকারীদের জন্য আনন্দিত হওয়ার বিশেষ দুটি মুহূর্ত রয়েছে। একটি হচ্ছে ইফতারের মুহূর্ত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের মুহূর্ত। *(সহীহ বুখারী, ১৯০৪)*

সাওম পালনকারীর জন্য জান্নাতের বিশেষ দরজা

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ باب الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا عَلٰى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ، فَهَلْ يُدْعٰى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ: نَعَمْ. وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

অনুবাদ: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোনো বস্তু এক জোড়া দান করবে তাকে জান্নাতের বিভিন্ন দরজা দিয়ে ডাকা হবে। বলা হবে, 'হে আল্লাহর বান্দা, এটি সর্বোত্তম দরজা। নামাজি ব্যক্তিকে জান্নাতে নামাজের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। মুজাহিদকে জিহাদের দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে। রোজাদারকে ডাকা হবে রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে। আর সদকাকারীকে ডাকা হবে সদকার দরজা দিয়ে। রাসূল স. এই হাদীস বর্ণনা করার পর হযরত আবু বকর ﵁ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। জান্নাতের সবগুলো দরজা দিয়েও কি কাউকে ডাকা হবে? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, 'অবশ্যই। আর আমি আশা করি, তুমিও তাদের অর্ন্তভুক্ত হবে। *(সহীহ বুখারী, ১৮৯৭; সহীহ মুসলিম, ১০২৭)*

সাওমের উপকারিতা

সাওমের অগণিত উপকারিতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল:

(ক) প্রথমত: মানসিক উপকারিতা

১. সিয়াম তাকওয়া অর্জন ও আল্লাহ ভীরু হতে সহায়তা করে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। *(সূরা বাকারা : ১৮৩)*

২. শয়তানী শক্তি ও কু-প্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল করে দেয়। মানবদেহের শরীরের যে শিরা-উপশিরা দিয়ে শয়তান চলাচল করে সাওমের ফলে সেগুলো নিস্তেজ ও কর্মহীন হয়ে পড়ে।

৩. সাওম হল আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও ইবাদতের প্রশিক্ষণ।

৪. আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ ও হারাম বস্তু থেকে দূরে থাকার সহনশীলতার প্রশিক্ষণ দেয় এ সাওম।

৫. ঈমান দৃঢ়করণ এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর সার্বক্ষণিক নজরদারীর অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়। এজন্য সাওম পালনকারী লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনেও কোন কিছু খায় না।

সাওম অবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় আমলসমূহ

১. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায় করা। কোন শরয়ী উযর না থাকলে সালাত মাসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করা। ছেলেদের জন্য জামাআতে সালাত আদায়কে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ওয়াজিব বলেছেন।

২. মিথ্যা না বলা।

৩. গীবত না করা- আর তা হলো অসাক্ষাতে কারো দোষত্রুটি বা সমালোচনা করা

৪. চোগলখোরী না করা- আর তা হলো এক জনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে কিছু বলে ক্ষেপিয়ে তোলা ও ঝগড়া লাগিয়ে দেয়া।

৫. ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য কাজে কাউকে ধোঁকা না দেয়া।

৬. গান গাওয়া ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো থেকে বিরত থাকা, মধুর কণ্ঠে গাওয়া যৌন উত্তেজনামূলক গান থেকে আরো বেশি সাবধান থাকা।

৭. সকল প্রকার হারাম কাজ-কর্ম পরিহার করা।

জাবের ﷺ বলেছেন,

إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عِنْدَ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَار وَسَكِيْنَة وَلَا يَكُنْ يَوْمُ صَوْمِكَ وَيَوْمُ فِطْرِكَ سَوَاء.

সাওম ভঙ্গের কারণ

সাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ দুই ধরনের

এক. কিছু সাওম ভঙ্গকারী বিষয় রয়েছে যা শরীর থেকে নির্গত হয়। যেমন যৌন মিলন, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা, মাসিক ঋতুস্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে যা শরীর থেকে বের হয় ও তা শরীরকে দুর্বল করে দেয়। তাই আল্লাহ ﷻ এগুলোকে সাওম বিনষ্টকারী বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন; যাতে করে সাওম পালনের দুর্বলতা এসব বস্তু নির্গত হওয়ার কারণে সৃষ্ট দুর্বলতার সাথে যোগ হওয়ার ফলশ্রুতিতে একজন সাওম পালনকারী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; ফলে সাওম তার স্বাভাবিক মধ্যম পন্থার সীমারেখা অতিক্রম করে।

দুই. কিছু সাওম ভঙ্গকারী বিষয় রয়েছে যা (শরীরে) প্রবেশ করে এমন ধরণের যেমন-খাওয়া, পান করা ইত্যাদি। একজন সাওম পালনকারী যদি কিছু খায় বা পান করে।

আর আল্লাহ ﷻ মূল সাওম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহকে একসাথে উল্লেখ করেছেন তাঁর এই বাণীতে :

فَالْئٰنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ

অনুবাদঃ সুতরাং এখন (রমাদানের রাতে) তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে মিলন করতে পারে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তার খোঁজ কর, আর খাও ও পান কর

ইতিকাফের পরিচয়

ইতিকাফ اَلعَكْفُ ধাতু হতে উৎপন্ন। যা বাবে ইফতি'আল-এর মাছদার। অর্থ : নিজেকে কোন স্থানে আবদ্ধ রাখা।

শারঈ পরিভাষায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে ইবাদত ও তেলাওয়াতের মধ্যে বদ্ধ রাখাকে ইতিকাফ বলা হয়। আর যে ব্যক্তি এভাবে আবদ্ধ থেকে মসজিদে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে তাকে বলা হয় মু'তাকিফ (مُعْتَكِفٌ) বা আকিফ (عَاكِفٌ)

ঘর বাড়ির আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করে, পার্থিব কোলাহল মুক্ত হয়ে, সব কিছুর আকর্ষণ এবং ভালোবাসা ভুলে, আত্মীয়তার বন্ধন ও প্রিয় মানুষদের মুহাব্বত এবং স্নেহ মমতার টান উপেক্ষা করে একান্তভাবে আল্লাহ ﷻ-র সান্নিধ্যলাভের আশায় মসজিদের নির্জন ও নিরিবিলি পরিবেশে একান্তে অনবরত অব্যাহতভাবে দিন রাত ইবাদত বন্দেগী করে যাওয়ার নাম ইতিকাফ।

ইতিকাফের প্রকার

ইতিকাফ তিন প্রকার। যেমন:

১. সুন্নত: রমাদানের শেষ দশকের ইতিকাফ।

২. নফল: বছরের যেকোনো সময়ের ইতিকাফ।

৩. ওয়াজিব: মানতের ইতিকাফ।

(আহসানুল ফাতাওয়া ৪ / ৪৯৮)

ইতিকাফের উদ্দেশ্য

ইতিকাফের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। নিজের গোনাহ মাফ করে নেওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল ইতিকাফ। তাবেঈ মাসরূক ﵀ বলেন, ব্যক্তির জন্য করণীয় হল সে এমন কোন স্থানে একাকী হবে, যেখানে সে নিজের গোনাহ স্মরণ করে তা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এক্ষেত্রে ইতিকাফ এক উত্তম মাধ্যম। আর এর মাধ্যমে 'লাইলাতুল ক্বদরকে' অন্বেষণ করা যায়।

আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদরের রাত অন্বেষণের উদ্দেশ্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হবার পূর্বে রমাদানের মধ্যেই দশ দিন ইতিকাফ করলেন। দশ দিন অতিবাহিত হবার পর তিনি তাঁবু তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তা গুটিয়ে ফেলা হল। অতঃপর তিনি জানতে পারেন যে, তা শেষ দশ দিনের মধ্যে আছে। তাই তিনি পুনরায় তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। তাবু খাটানো হল। এরপর তিনি লোকদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমাকে ক্বদরের রাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু দুজন ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করতে করতে উপস্থিত হল এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। তাই আমি তা ভুলে গেছি। অতএব তোমরা তা রমাদান মাসের শেষ দশ দিনে অন্বেষণ কর।

ইতিকাফের শরয়ী বিধান

ইতিকাফ উত্তম ও ফজিলতপূর্ণ ইবাদতের মধ্যে একটি। আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ রমাদানের শেষ দশকে আমরণ ইতিকাফ করে গেছেন।' *(বুখারী)*

মহিমান্বিত রাত : লাইলাতুল ক্বদর

লাইলাতুল ক্বদরের পরিচয়

শবে ক্বদর (ফার্সি: شب قدر) বা লাইলাতুল ক্বদর (আরবি: لَيْلَةُ الْقَدْرِ) এর অর্থ "অতিশয় সম্মানিত ও মহিমান্বিত রাত" বা "পবিত্র রজনী"। ফার্সি ভাষায় "শাব" ও আরবি ভাষায় "লাইলাতুল" অর্থ হলো রাত্রি বা রজনী, অন্যদিকে 'ক্বদর' শব্দের অর্থ সম্মান, মর্যাদা, মহাসম্মান। এ ছাড়া এর অন্য অর্থ হল ভাগ্য, পরিমাণ ও তাকদির নির্ধারণ করা।

আল-কুরআনের আলোকে লাইলাতুল কদর

আল্লাহ ﷻ ক্বদর এর রাতকে সম্মানিত করেছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম নাযিল এর মধ্য দিয়ে। এর বাইরে এই রাত সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ ﷻ 'সূরাতুল ক্বদর' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরাও নাযিল করেছেন।

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল ক্বদর'(الْقَدْرِ) শব্দটি থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরাটির মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে দ্বিমত রয়ে গেছে। আবু হাইয়ান বাহরুল মুহীত গ্রন্থে দাবী করেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটা মাদানী সূরা । আলী ইবনে আহমাদুল ওয়াহেদী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এটি মদীনায় নাযিলকৃত প্রথম সূরা।

অন্যদিকে আল মাওয়ারদী বলেন , অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মক্কী সূরা । ইমাম সুয়ূতী ইতকান গ্রন্থে একথাই লিখেছেন।

মুসলিমদের সর্ববৃহৎ উৎসবঃ ঈদ

ঈদ এর পরিচয়

যে সব আনুষ্ঠানিক উৎসব মুসলমানদের অস্তিত্বের জানান দেয় 'ঈদ' তার অন্যতম। 'ঈদ' শব্দটি আরবি। যা আওদ্ থেকে উৎকলিত। এর শাব্দিক অর্থ ঘুরে ঘুরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। প্রচলিত অর্থে ঈদ মানে আনন্দ বা খুশি। যেহেতু এ আনন্দ বছর ঘুরে ফিরে আসে এজন্য ঈদকে 'ঈদ' নামে নামকরণ করা হয়েছে। মুসলমানদের জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ঈদ। এ শব্দ দ্বারা এ দিবসের নাম রাখার তাৎপর্য হলো আল্লাহ ﷻ এদিন তার বান্দাদের নিয়ামত ও অনুগ্রহ দ্বারা বারবার ধন্য করেন ও বারবার তাদের প্রতি ইহসানের দৃষ্টি দান করেন। যেমন রমাদানে পানাহার নিষিদ্ধ করার পর আবার পানাহারের আদেশ প্রদান করেন। সদকায়ে ফিতর, হজ্জ-যিয়ারত, কোরবানির গোশত ইত্যাদি নিয়ামত তিনি বারবার ফিরিয়ে দেন। আর এ সব নিয়ামত ফিরে পেয়ে ভোগ করার জন্য মানুষ আনন্দ-ফুর্তি করে থাকে।

ঈদের ইতিহাস

মহানবী ﷺ এর মক্কার তেরো বছরের জীবনে সাওম ও ঈদের বিধান প্রচলিত ছিল না। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় তাঁর আগমনের আগে 'নওরোজ' ও 'মেহেরজান' নামক দুটি উৎসব প্রচলিত ছিল। মদিনাবাসীরা নববর্ষ উপলক্ষে নওরোজ ও বসন্তকাল উপলক্ষে মেহেরজান অনুষ্ঠান পালন করত এবং সেখানে নানাবিধ আনন্দ-ফুর্তি ও খেল-তামাশা করত। যার মধ্যে অশ্লীলতা, মদপান ও বেহায়াপনা মিশ্রিত ছিল।

মহানবী ﷺ এর দাওয়াতে অনেক মদিনাবাসী ইসলাম কবুল করে। ইসলাম কবুলের কারণে তাদের জন্য নওরোজ ও মেহেরজান উৎসব নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তারা মহানবী ﷺ এর কাছে এমন উৎসব কামনা করেন, যেখানে বৈধভাবে উৎসব করা যায়। এরই মধ্যে দুটি বছরও কেটে যায়। অতঃপর ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে রমাদানের সাওম ফরজ হয়। এ সময় আল্লাহ ﷻ জাহিলি যুগের দুটি উৎসবের পরিবর্তে ইসলামে দুটি উৎসব প্রবর্তন করেন। একটি ঈদুল ফিতর অন্যটি ঈদুল আযহা। *(নাসায়ি)*

হযরত আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'দিনের কী তাৎপর্য আছে? মদিনাবাসীগণ উত্তর দিলেন, আমরা জাহেলি যুগে এই দুই দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ﷻ এই দুই দিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দিয়েছেন। তা হলো: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। *(সুনানে আবু দাউদ, ১১৩৪)*

শুধু খেলাধুলা, আমোদ-ফুর্তির জন্য যে দুটো দিন ছিল আল্লাহ তা পরিবর্তন করে এমন দুটো দিন দান করলেন যে দিনে আল্লাহর শুকরিয়া, তার যিকির, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে শালীন আমোদ-ফুর্তি, সাজ-সজ্জা, খাওয়া-দাওয়া করা হবে। দ্বিতীয় হিজরিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথম ঈদ পালন করেছেন।

ঈদের রাতের ফজিলত

মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত হল ঈদের রাত। এ রাতে জেগে থেকে ইবাদতের ফলে মুমিনের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। ঈদের রাত শুধু আনন্দ উৎসবের রাত নয়। বরং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও সেতুবন্ধনের রাত। ঈদের রাতে ইবাদাত বন্দেগির ফজিলত, গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক। এ